মাতৃভাষা এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যম

ফিরোজ আহমেদ

"কিছুদিন আগে এই প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরেই শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহারের সময় এসে গেছে। শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে এমন একজন শিক্ষক হিসেবে আমার স্থির অভিমত এই যে, যথেষ্ট সময় বাঁচানো ও ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ়তর ভিত্তি গাঁথা সম্ভব, যদি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও ছাত্রেরা সহযোগিতা করেন, তাদের সমস্যার খোলাখুলি আলোচনা ও তার সমাধানের জন্য একযোগে কাজ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন বিদেশী ভাষা এসে দাঁড়ালে মস্ত অসুবিধা দেখা দেবেই। কথাবার্তা ও শিক্ষার বাহন হিসেবে সর্বদাই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে হলে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র অনেক সময়েই ঠিকমত মনের কথা বলতে পারে না এবং শিক্ষক নিশ্চিন্ত হতে পারেন না যে, ছাত্রকে যা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে তার সবটাই বুঝতে পেরেছে কি না। বর্তমান পদ্ধতি যে মুখস্থ করতে প্ররোচনা যোগায়, এতে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায় না–সে সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়।"– সত্যেন বোস, শিক্ষা ও বিজ্ঞান, কালান্তর, ১১ মে ১৯৬৩।

"প্রায় এক-শ' বছর হল পাশ্চাত্য জাতের হাতে ঘা খেয়ে জাপান ঠিক করল, যে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য প্রতীচ্য এত শক্তিমান হয়েছে, সে জ্ঞান ও সে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। এখনও এক-শ' বছর হয় নি। এরই মধ্যে জাপানের কীর্তি-কলাপের কথা সকলেই জানেন। বিশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানের হার হল তখন জাপানের দুরবস্থার শেষ ছিল না, আজ কিন্তু জাপানে গেলে মনে হবে না যে এরকম কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল।"

ফলে কৌতূহলী সত্যেন বোস খবর নিলেন জাপানের এই অগ্রগতির রহস্যের। সেখানে তখন প্রতিটি ছেলেমেয়েকে নয় বছর বিদ্যালয়ে কাটাতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে, এর ব্যয়টা সমাজই বহন করে। সত্যেন বোস আরো বলছেন, *"আমার প্রথমে ধারণা ছিল যে হয়ত কোন একটা বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করে জাপানে বিজ্ঞান কিংবা শিল্পকলা শেখান হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, আমার ধারণা ভুল। আমি অনেক বই যোগাড় করেছিলাম। তার অধিকাংশই জাপানীতে লেখা। তাই পাঠোদ্ধার হয়নি। অবশ্য দু'চারখানা ইংরেজি বইও তার সঙ্গে পেয়েছি।"*

> "ইংরেজি ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি বহুবিধ", স্বয়ং উইলিয়াম শেকসপিয়ারের কালে শিক্ষার মাধ্যম কী হবে, সে বিষয়ে স্বয়ং ইংরেজ মুলুকে অভিজাতদের বড় একটা অংশের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এরকমই।

তাদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি বোঝেন, তাঁরাও ইংরেজিতে কথা বলেন না। কারণ *"তাঁদের মনে এমন বিশ্বাস ছিল না যে, ইংরেজি বললে নিজের মনের ভাব স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবেন। সেই জন্য যেসব বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই জাপানী ভাষাতেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করছিলেন। দেখা গেল, শুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা বর্তমান বিজ্ঞানের উচ্চস্তরে কথা–সবই জাপানী ভাষায় বলা সম্ভব এবং জাপানী কথায় তা বলবার জন্য লোকে ব্যগ্র।"*

"আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় জাপানী ভাষার কতগুলি অসুবিধা আছে। যাঁরা একটু খবর রাখেন তাঁরাই তা জানেন। একটা অসুবিধা হল এই যে, আমাদের যেমন অল্পসংখ্যক অক্ষর দ্বারাই সব বাক্য লেখাও যায়, বইতেও ছাপানো যায়, জাপানী ভাষাতে সে ব্যবস্থা নেই। আছে নিজের অক্ষর এবং চৈনিক অক্ষর প্রায় হাজার তিনেক। যারা উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক, তাদের এ সবকটাকেই শিখতে হয়। এর জন্য আমাদের দেশে যেখানে মাতৃভাষা বছরখানেক বা বছর দুয়েকের মধ্যে চলনসই আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়, ছেলেমেয়েদের সেখানে জাপানী ভাষা শিখতে গড়ে লাগে প্রায় ছয় বছর। এত অসুবিধা সত্ত্বেও এমন অবস্থা জাপানী ভাষার যে, প্রত্যেক জাপানী বিজ্ঞানী, জাপানী দার্শনিক নিজেদের মনের প্রত্যেকটি কথা জাপানীতে প্রকাশ করতে পারেন।"

বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব কি না, অথবা এর আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, সে নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। সম্প্রতি এমন আরো একটি ধারাবাহিক বিতর্ক ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হলো। অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিগত আক্রমণগুলো বাদ দিলে এই বিতর্কে বিজ্ঞান শিক্ষা, সমাজে বিজ্ঞানচেতনার বিস্তার এবং সাধারণভাবে এগুলোর সাথে মাতৃভাষায় শিক্ষার সম্পর্কের প্রশ্নটি উঠে এসেছে দারুণভাবে। এই বিতর্কটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল দেশে ও বিদেশে অগ্রগণ্য কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার সাথে জড়িত ব্যক্তিত্বদের পর্যবেক্ষণজাত মতামত ও পরামর্শ।

শুরুটা হয়েছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের শিক্ষক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদীর একটা প্রশ্ন থেকে, বাংলায় সেটা দাঁড়াবে এমন : তো, ছেলেমেয়েরা, বিজ্ঞান-করার সময় ভাবনাটা আসে কোন ভাষায়–মাতৃভাষায়, না ইংরেজিতে? এই 'বিজ্ঞান-করিয়ে'দের উত্তরগুলো ছিল বিস্ময়কর। সংখ্যাল্প দু-একজন বাদে বাংলার পক্ষেই সকলের একবাক্যে উত্তর। এঁদের কথার মূল সুর এই যে, ইংরেজিতে তাঁদের পড়তে এবং পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয় বটে, কিন্তু সেগুলো তাঁরা বাংলায়ই আত্মস্থ করেন; বাংলায় মনে রাখতে সুবিধা হয়; বিষয়গুলো ইংরেজিতে শেখার পরও দেখতে পান যে, বাংলায়ই তাঁরা চিন্তা করছেন; এমন উত্তরও এসেছে যে, চিন্তার কোনো ভাষা নেই, সেটা একটা প্রক্রিয়া মাত্র। এঁদের মাঝে কেউ কেউ দীর্ঘ অভ্যাসে ইংরেজি ভাষায় চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। অনেকেরই একটা সাধারণ বক্তব্য, পরিভাষাগুলো ইংরেজিতেই আসে।

যেমন–এমআইটির এক শিক্ষার্থী বলেছেন, *"আমি term,jv English- এ চিন্তা করি, ফর্মুলা, কনস্ট্যান্ট সব ইংলিশেই চোখে ভাসে কিন্তু এমনই যে ঃযবড়ৎবঃরপধষ ভাবনা, সেটা তো মনে হয় কোনো ভাষা ছাড়া ছবি দেখার মতো কল্পনা করি। চুম্বক, পড়ন্ত বল, দোলকের দোলন, উঘঅ-এর ভেঙে যাওয়া মনে মনে নিজেকে কিছু বোঝালে বা*

প্রশ্ন করলে সেটা মাতৃভাষায় করি বলেই তো মনে হচ্ছে।"

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী বলেন, "টার্মগুলো ইংরেজিতেই মাথায় আসে, কিন্তু চিন্তাটা বাংলায় হয়। আসলে চিন্তা কী, সবই তো ভিজ্যুয়ালাইজ করি, ভাষার কথা মাথায় থাকে না তখন। সম্ভবত বাংলিশে ভাবি। স্যার, চিন্তার কি ভাষা থাকে? নিজেকে প্রশ্ন করার সময় অবশ্য বাংলা ব্যবহার করি।"

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে পিএইচডি গবেষণরত একজন মন্তব্য করেছেন, *"মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ততটাই জরুরি, যতটা জরুরি সে ভাষায় কাব্যচর্চা। বিজ্ঞানচর্চায় মাতৃভাষার অপরিহার্যতা যাঁরা বোঝেন না, আমি নিশ্চিত, তাঁরা বিজ্ঞানের এই কাব্যময়তার সাথে পরিচিত নন।"*

মোটামুটি এগুলোই হলো ওই প্রশ্নের উত্তরে আসা অধিকাংশ বিজ্ঞান-করিয়ের মতামত। এখান থেকে সাধারণভাবে জানা গেল যে, বাংলাভাষী বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের সুবিপুল একটা অংশই চিন্তার ক্ষেত্রে বাংলাই ব্যবহার করছেন, কিংবা ভাষাহীন ছবির জগতে চিন্তা করছেন, যদিও কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর বড় অংশটা ইংরেজি ভাষা থেকেই এসেছে। ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনায় যুক্ত একজন শিক্ষক জানিয়েছেন, জাপানি পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বাক্যটা থাকে জাপানিতে (মাতৃভাষায়), আর পরিভাষাগুলো থাকে দুই ভাষায়ই। কিন্তু ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার একজন শিক্ষক আমাদের জানাচ্ছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা– *"চিন্তা তো বাংলায়ই করতে হয়, কিন্তু scientific termগুলো তো আমরা বাংলায় কখনো শিখিই নাই। আমার ল্যাবে কিছু চায়নিজ আছে, ওরা অনেক ইংরেজি ঃবৎস জানেই না। কিন্তু scientist হিসেবে যথেষ্ট ভালো।"*

> মধ্যবিত্ত চেনার একটা সহজ তরিকা হলো, ইতিহাসের বীরদের সে পূজা করে বটে, তাদের সকলের নামধাম তার মুখস্থ, কিন্তু তার নিজের সময়ে সমাজে কী কী সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে, হচ্ছে এবং বহু ক্ষেত্রে অগোচরে অচিরেই শুকিয়েও যাচ্ছে, তার খবর রাখার সময় যে তার নেই।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক একটা দীর্ঘ মূল্যায়ন করেছেন, সংক্ষিপ্তাকারে তাঁকে উদ্ধৃত করছি: *"প্রশ্নটার সোজা উত্তর, নিজের ভাষায় চিন্তা করি। বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান–সব ক্ষেত্রেই। বাংলা যে বিজ্ঞান ধারণে অক্ষম, তার কারণ ভাষার দৈন্য নয়, তার কারণ বাংলা ভাষার ইনফ্লেক্সিবিলিটি। অবশ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা অতি সমৃদ্ধ দাবি করে নিজেরা নিজেরা পিঠ চাপড়াচাপড়ি করা আমাদের একটা জাতিগত আত্মম্ভরিতা। সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনবোধ্য করার জন্য ইংরেজি ভাষার গা থেকে অ্যারিস্টোক্রেসির চাদর খুলে ফেলে তাকে ইতরীকরণ করা হয়েছে, উল্টো দিকে বাংলা ভাষা স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছে ড্রয়িংরুমে। ইতরীকরণ জিনিসটা ঠিক কী, আমি একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টরে চ্যানেলের ভেতর দিয়ে কারেন্ট এক্সাইটেশন এবং কারেন্ট ফ্লোর ডিরেকশন অনুসারে তিনটি টার্মিনালের নাম দেওয়া হলো সোর্স, গেট ও ড্রেন, যেন নাম শুনেই এদের পারপাস এবং মাইনরিটি ক্যারিয়ারের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দেখুন, ড্রেনের মতো একটা ওঁচা শব্দ সুয়্যারেজ সিস্টেমের গণ্ডি ছাড়িয়ে কত অনায়াসে ঠাঁই করে নিয়েছে বিজ্ঞানের সবচেয়ে ডেলিকেট বিষয়ের অভিধানে। ভীষণ রকম মৌলবাদী বাংলা ভাষা প্রেমিকের পক্ষেও কি এখানে 'ড্রেন' শব্দটাকে 'নর্দমা' দিয়ে প্রতিস্থাপনের চিন্তা করা সম্ভব? কেজো লোকের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আরেকটা বড় বাধা হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েশন, শব্দসংক্ষেপকরণ। গঙঝঋউঞ শব্দটার কথাই ধরুন। প্রতিটি অক্ষর এখানে একেকটা সিগনিফিক্যান্ট অর্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। ভেবেই জ্বর এসে যাচ্ছে যে, এই নিয়ম অনুসরণ করতে গেলে শব্দের বাংলা রূপটি কত বিভীষিকা হতে পারে।"*

এবং অনতিবিলম্বেই বাংলা পরিভাষা বিষয়ক এই সংকট নিয়ে ততোধিক একটা মূল্যবান মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট একজন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী, শুনি তাঁর কথা : *"একটা দেশের সার্বিক সাক্ষরতা ও কারিগরি সংস্কৃতির ওপর বিজ্ঞানে মাতৃভাষার ব্যবহার নির্ভর করে। ঃযবৎসড়সবঃবৎ-কে তাপমান যন্ত্র বললে আমরা হাসিঠাট্টা করি, অথচ সমগ্র জাতির জন্য যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থা যদি থাকত, তাপমান যন্ত্র বলা মাত্রই সেটার বাহ্যিক রূপ বা অন্তর্নিহিত কর্মকাণ্ড ততক্ষণাৎ মনে-মস্তিষ্কে যে সমস্ত যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার, সেগুলো করত। একটি জাতির কারিগরি সংস্কৃতি উন্নত হলে ট্রানজিস্টরের drain-কে নর্দমা না হলেও নির্গম প্রণালী বলা সম্ভব। মুশকিল হচ্ছে, ২০-২৫ কোটি লোকের মধ্যে হয়তো এক শ লোক Field Effect Transistor নিয়ে কাজ করে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে চর্চা করলে হাজার হাজার মানুষ যেভাবে উপকৃত হতো, এই এক শ বিশেষ লোকের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। আমি অনেক বছর দেশের বাইরে আছি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কী ভাষায় চিন্তা করছি, সেটা অনেক সময়ই বলতে পারি না। ইংরেজি হলে ইংরেজি, বাংলা হলে বাংলা। এটুকু বলতে পারি, এই লেখাটা লিখতে ইংরেজি থেকে মস্তিষ্কে কোনো ম্যাপিং হয়নি, বাংলায়ই হয়েছে।"*

এটুকু থেকে এই সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে:

১. এই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রায় সকলেই বাংলায়ই চিন্তা করতে অভ্যস্ত, যদিও শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে ইংরেজিতে, ফলে এই ভাষাটাও তাঁরা রপ্ত করেছেন।

২. কিন্তু পরিভাষাসমূহ অধিকাংশ ইংরেজিতেই। ইংরেজি পরিভাষাকে বাংলা করার বিরুদ্ধে কিছু মত এসেছে এই কারণে যে, তাতে অনেক সময়ই যথাযথ ভাবটি প্রকাশ পায় না, কিন্তু এর উত্তর সর্বশেষ জন দিয়েছেন এই বলে যে, যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থা ও কারিগরি সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকলে যেকোনো বাংলা পরিভাষা শুনেও একই অনুভূতিই ক্রিয়া করত।

৩. প্রবাসে তাঁরা এমন ভিনদেশি বহু শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যাঁরা বিজ্ঞানী হিসেবে যথেষ্টই ভালো, কিন্তু এমনকি ইংরেজি পরিভাষাগুলোও জানেন না। তাঁদের আগাগোড়া বিজ্ঞান শিক্ষা মাতৃভাষায়ই হয়েছে।

মতভেদ: বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়

কিন্তু ফারসীম মান্নান মোহাম্মদীর ওই প্রশ্নের উত্তরেই অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী একজন বিশিষ্ট বাঙালি প্রাণরসায়ন বিজ্ঞানী মতামত দেন, *"বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব যিনি এটি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন তিনি হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।"*

ফাহামের পরিহাসটা এই কারণে আরো বেশি অর্থবহ, কেননা এই বাক্যটি নির্মিত হয়েছে বাঙালি বিজ্ঞান চিন্তার অন্যতম একটি চূড়াবিন্দু অধ্যাপক সত্যেন বোসের একটি বিখ্যাত বাক্যকে উল্টে দিয়ে, তিনি বলতেন : "যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।"

এখানে আমরা অন্তত একজন মানুষকে পেয়েছি, যিনি দ্বিধা না করে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন, জানিয়েছেন মাতৃভাষা বাংলার দৈন্য এত

বেশি যে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের বিকাশ এতটাই হয়ে গেছে যে, বিজ্ঞান চর্চার বা শিক্ষার বাহন বাংলা কিছুতেই হতে পারে না। এই মত প্রকাশ এ কারণেও গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের রাষ্ট্রের অধিকাংশ নীতিনির্ধারকের মতও আসলে এটাই। সাধারণ মানুষের আবেগে আঘাত আসবে বলে সেটা তাঁরা প্রকাশ করেন না, কিন্তু এই মৌল নীতির ভিত্তিতেই বাংলাদেশের বিজ্ঞান শিক্ষা এবং সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার তোড়জোড় চলছে।

প্রশ্নটিকে দুইভাবে বিবেচনা করা যায়–বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা বা সাধারণভাবে জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা, এটা জ্ঞানের সর্বজনীনীকরণের প্রশ্ন; দ্বিতীয়ত, বাংলায় উচ্চচিন্তার প্রকাশের সম্ভাব্যতা, এটা বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতার পরীক্ষার প্রশ্ন। প্রথম ক্ষেত্রটিতে খুব কম মানুষই আজ আর আপত্তি করেন না, দ্বিতীয়টির বিষয়ে মতভেদ কিছু আছে। কিন্তু আমরা দেখাতে চাই, ঐতিহাসিকভাবেই দ্বিতীয় স্তরটির ভিত্তি নির্মিত হয় প্রথম শর্তটি পূরণ করা সম্ভব হলেই।

কী হবে শিক্ষার মাধ্যম?

"ইংরেজি ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি বহুবিধ", স্বয়ং উইলিয়াম শেকসপিয়ারের কালে শিক্ষার মাধ্যম কী হবে, সে বিষয়ে স্বয়ং ইংরেজ মুলুকে অভিজাতদের বড় একটা অংশের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এরকমই। ইংরেজদের মাতৃভাষা ইংরেজিতে জ্ঞানচর্চার বিরুদ্ধে আপত্তিগুলো খুব চেনা ঠেকবে, মনে হবে একালে বাংলায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের বিরুদ্ধে যে ধারণাগুলো মধ্যবিত্তের বাঙালি সমাজে আজও চালু আছে, সেগুলোতেই ভাষার নামটা শুধু কেটে ইংরেজি বসানো হয়েছে। যেমন–'শিক্ষা উচ্ছন্নে যাবে, কেননা ধ্রুপদি ভাষাশিক্ষার জন্য আর প্রণোদনা থাকবে না'; 'ইতর লোকজনের মাঝে শিক্ষার বিস্তার তো বিপজ্জনক'; 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের জন্য ইংরেজি ভাষা অসুবিধাজনক, কারণ এটাতে প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দের ঘাটতি আছে'; 'ইংরজি একটা 'স্থূল' আর 'বর্বর' স্বভাবের ভাষা, নিদারুণ এর প্রকাশের ক্ষমতার অভাব'; 'ভাষাটা অসুবিধাজনক আর অস্থিরমতি, বিপরীতে ধ্রুপদি গ্রিক আর লাতিনে অর্থ সর্বদা 'স্থিরীকৃত''; 'ব্রিটেনের বাইরে এই ভাষা সাধারণভাবে কেউ জানে না, আর লাতিন একটা আন্তর্জাতিক ভাষা' ইত্যাদি!

> জার্মান, স্প্যানিশ, ফরাসি, আরবি, ফারসিসমেত আরো বহু ভাষায় নিত্যনতুন জ্ঞান তৈরি হচ্ছে, ইংরেজির আয়োজনের বিপুল ব্যয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকায় সেগুলোর দিকে তাকানোর সময় আমাদের নেই।

ইয়স্তাইন গোর্ডারের 'সোফির জগৎ' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের সংহতি সংস্করণের ভূমিকায় অনুবাদক জি এইচ হাবীব বাংলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের দশা নিয়ে তাঁর 'বিলাপে' উদ্দেশ্যমূলকভাবেই পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন চার্লস বার্বারের 'দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দি এইজ অব শেকসপিয়ার' নামের প্রবন্ধটির সাথে। ওপরে উদ্ধৃত অংশটুকু সেখান থেকেই অনুবাদকৃত।

ইতিহাসজুড়েই দোদুল্যমান মধ্যবিত্তের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, ইতিহাসের টুকরাটাকরা অনেক উদাহরণ তাঁরা হাজির করতে পারেন বটে, ইতিহাসের শিক্ষাটা কিন্তু তাঁরা কখনোই ঠিকঠাকমতো গ্রহণে সক্ষম নন। *"শেকসপিয়ারের জমানা থেকে টেমসে কত জল গড়িয়েছে, খবর রাখেন মশায়?"*–এমন কিছু বলে এঁরা যদি তেড়ে আসেন, কী বলবেন তাঁকে! না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কী কী মৌলিক বদল হয়েছে, শব্দ ধরে ধরে মাতৃভাষায় তার প্রতিফলন কত দূর হতে পারে, সেই তর্কে ঢুকে পড়ার বদলে তাঁকে বরং আরেকটা গল্প শুনিয়ে দিন, তুলনামূলকভাবে আমাদের সমকালীন ইতিহাসের।

"আমার দাদা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৮০-এর দশকের শুরুর দিককার স্নাতক। তাঁর খেরোখাতা ভর্তি ছিল ইংরেজিতে। আমার পিতা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২০-এর দশকের স্নাতক, আর তাঁর খেরোখাতার আধাআধি ছিল ইংরেজিতে, বাকি আধখানা জাপানি ভাষায়। এক প্রজন্ম পর আমি যখন স্নাতক হই, আমার সবটা টোকাটুকি হয়েছিল জাপানি ভাষায়। এভাবেই আমাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতাকে পুরোটা আত্মস্থ করতে লেগেছিল তিনটে প্রজন্ম।" চিনুয়া আচেবে তাঁর 'What has Literature Got to do with it?' Hopes and Impediments গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধে এভাবেই বর্ণনা করেছেন ওয়াজেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চিনিচিরো তোবার এই অসাধারণ সারসংকলনটুকু।

কিন্তু এই উদাহরণেও কোনো ফললাভ না-ও হতে পারে। তারা বলতেই পারে, *"খুব তো জাপানি অভিজ্ঞতা ফলাচ্ছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর দিয়ে কত সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়েছে, সে খবর রাখেন?"* মধ্যবিত্ত যদি হা রে রে রে করে এর পরও তেড়ে আসে, জবাব এ আশায় দেবেন না যে, তাতে তার চিত্তের কোনো বদল হতে পারে। মধ্যবিত্ত চেনার একটা সহজ তরিকা হলো, ইতিহাসের বীরদের সে পূজা করে বটে, তাদের সকলের নামধাম তার মুখস্থ, কিন্তু তার নিজের সময়ে সমাজে কী কী সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে, হচ্ছে এবং বহু ক্ষেত্রে অগোচরে অচিরেই শুকিয়েও যাচ্ছে, তার খবর রাখার সময় যে তার নেই। কিন্তু জবাবটা খোঁজা দরকার, সেই তর্কটা শুনছে এমন আর পাঁচজনের জন্য।

সকল যুগে সকল কালেই বিজ্ঞানে যে পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়, সেগুলোকে আত্মস্থ করার জন্য অন্য একটি ভাষাকে পুরোটা অভিজ্ঞতা পাড়ি দিতে হয় না; বরং সুচিন্তিত 'বিজ্ঞানসম্মত' পন্থা অবলম্বন করলে তার পক্ষে সম্ভব অনেক কম সময়ের মধ্যেই এই সামগ্রিক জ্ঞানকে আত্মস্থ করা। ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতাটি শিল্প বিপ্লবের শুরুর দিককার, জাপানের আধুনিকায়নের অভিজ্ঞতাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, তেমনটাও নয়। হালের পরাশক্তি চীন ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের পর তার শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু করে। আমাদের সমাজে আধুনিকায়ন মানে কেন জানি শিক্ষায় কয়েক পোঁচ ইংরেজি বুলিয়ে দেওয়া। চীনারা সেই রাস্তায় হাঁটেনি, তারা প্রাথমিক থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, এমনকি তারা খুব সামান্য পরিমাণে ইংরেজি পরিভাষাও গ্রহণ করেনি, কোনো না কোনোভাবে বিদেশি বস্তুসমূহকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছে। হালের কোরিয়া, মালয়েশিয়াও শিক্ষার এই আধুনিকায়নের মস্ত উদাহরণ। অথচ আমরাই আধুনিকায়নের নামে শিক্ষার্থীদের ওপর ইংরেজির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করছি।

ভাষার অগ্রগতি-পশ্চাৎপদতার সাথে তাই দৌড় প্রতিযোগিতার তুলনা চলে না। অন্য একটা সভ্যতার শত বছরের অর্জন ভিন্ন একটি সভ্যতা অনুবাদের মাধ্যমে দশ বা বিশ বছরের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারে। কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থাকবেই, কিন্তু সেটা নিশ্চিতভাবেই ভিন্ন ভাষায় আত্মস্থ করার তুলনায় বহু বহু গুণ কম হবে।

উচ্চস্তরে শুধু নয়, মাতৃভাষায় যথেষ্ট পরিমাণ বাংলা বই নেই, এটার মর্মান্তিক বিয়োগান্ত পরিণতি আমরা শুধু বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে না, সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভোগ করছি। সত্যি কথা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু ভালো বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ইংরেজিতে তাঁদের ব্যক্তিগত

সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়েছেন, এটা আনন্দের। কিন্তু এই আনন্দের পাশাপাশি আমরা ভুলে থাকতে পারি না যে, অজস্র সংখ্যক বাঙালি বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটানোর জন্য দরকার মাতৃভাষায় তার ভিত্তি স্থাপন। বিজ্ঞানের আনন্দঝরনা বাংলায় প্রবাহিত হলে সেদিন ইংরেজিতেও যাঁরা সফল হয়েছেন, তাঁরা মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না, সেটাও নিশ্চিত জানি। আইনস্টাইন সম্ভবত ফরাসি আর ইংরেজি পরীক্ষায় ফেল মেরেছিলেন। পরভাষাকে শিক্ষার মানদণ্ড হিসেবে স্থাপন করলে অজস্র মৌলিক সৃজনীক্ষমতার শিক্ষার আওতার বাইরে চলে যাবার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। শিক্ষার দুটো লক্ষ্য–পুরনো জ্ঞানের বিচ্ছুরণ আর নতুন জ্ঞান নির্মাণ। পরেরটার যথাযথ বিকাশের জন্যই দরকার প্রথমটার শক্ত ভিত্তি। কিন্তু এই ভিত্তিস্থাপনকে, যা আসলে সাধিত হয় জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, তাকে উপেক্ষা করাটা মোটেই সংগত হবে না।

ফাহাম আবদুস সালাম তাই বলেন, *"হ্যাঁ, খুব আধো আধো একটা ধারণা দেওয়া সম্ভব, সেটা খুব ভালোভাবেই সম্ভব; তবে সেটা বিজ্ঞানের খুব সাধারণ বিষয়ে এবং সেইসব পাঠকের জন্য, যাঁরা বিজ্ঞান চর্চা করবেন না, হালকা-পাতলা জানলেই খুশি। যেটাকে আমরা বিজ্ঞানচর্চা বলি অর্থাৎ বেঞ্চওয়ার্ক, পাবলিকেশন–এসব নিয়ে আপনার একটা ক্যারিয়ার দাঁড়িয়ে যাবে, সেটা ইংরেজিতেই করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, আমাদের ভাবতেও হবে ইংরেজিতে। এর কোনো বিকল্প নেই। যাঁরা এই সহজ বাস্তবতাটা অনুধাবন করেন না, তাঁদের পিছিয়েই পড়তে হবে ক্রমাগত।"*

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহাসিক কিছু সীমাবদ্ধতা যদি থেকেই থাকে, সেটাকে আমরা আর সব জাতির মতোই কিভাবে দূর করতে পারি, সে বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য উদ্ধৃতিতে আরো মারাত্মক একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ আমরা দেখতে পেয়েছি, সেটা জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান সাহিত্য বিষয়ে। জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান সাহিত্য নিশ্চিতভাবেই প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানচর্চা নয়, কিন্তু এটা ছাড়া কোনো জাতিরই বিজ্ঞানী পয়দা করার সক্ষমতা অর্জিত হতেই পারে না।

যে ছেলেটা বা যে মেয়েটা এইট পাস করে কৃষিতে শ্রম দেবেন, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা গণিতের জ্ঞান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় চেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি ধস্তাধস্তি তাঁকে করতে হয়েছে ইংরেজির সাথে। তাঁর পেশা, জীবন–কোনো কিছুর সাথেই ইংরেজির আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। শিক্ষাজীবনেরই একটা বিরাট সময় ব্যয় হয় ইংরেজির হেস্তনেস্ত করার বৃথা আয়োজনে।

তো, এমন একজন পাঠকের কথা বলা যাক, যিনি ঠিক সাধারণ পাঠক ছিলেন না, বিজ্ঞানের হালকা-পাতলা নয়, মোটামুটি গভীরেই যেতে চেয়েছিলেন, পেরেছিলেন কি না তা পাঠকদের বিবেচনা। দক্ষিণ জার্মানির সংখ্যালঘু ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রথা অনুযায়ী বিষ্যুদবার রাতে বাড়িতে খেতে আসতেন দরিদ্র এক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র। সাথে নিয়ে আসতেন বিজ্ঞানবিষয়ক জনপ্রিয় বইপত্র। সেগুলোর গোগ্রাসী পাঠক ছিলেন বারো বছরের খুদে এক কিশোর। পরবর্তীতে বিখ্যাত হয়ে তিনি লিখেছিলেন, *"এইসব জনপ্রিয় বই পড়ে দ্রুতই আমার এ প্রত্যয় জন্মাল যে, বাইবেলের অধিকাংশ গল্পই গাঁজাখুরি। এর ফলাফল হলো মুক্তচিন্তার একটা উন্মাদপ্রায় স্ফূর্তি, আর তার সাথে এই বোধ যে, রাষ্ট্র তরুণদের উদ্দেশ্যমূলকভাবেই মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রতারিত করে আসছে। নিজের মাঝে ভাঙচুর হবার মতো অনুভূতি ছিল সেটা।"*

বারো বছরের সেই বালক পরবর্তীতে পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন, তিনি আইনস্টাইন। মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষায় তিনি চিন্তা করতে সক্ষম ছিলেন না, জীবনের বড় একটা সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকেও তাঁর ইংরেজি ছিল আড়ষ্ট। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানবোধের জন্ম হয়েছিল মাতৃভাষায় জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান গ্রন্থ পাঠ করে।

চীনারাও ইংরেজি শিখছে!

চীনারাও তো ইংরেজি শিখছে, এক বন্ধুর পর্যবেক্ষণ। ব্যবসা বা পেশার প্রয়োজনে না শেখার কারণ নেই। কিন্তু বাকি দুনিয়া কী শিখছে, ইংরেজ মুলুকসমতে, সেটা জানতেও তো রকেট সায়েন্স লাগে না, সমাজবিজ্ঞানের কাণ্ডজ্ঞান লাগে। ভয়েস অব আমেরিকার একটা রিপোর্টে দেখলাম একটা প্রতিবেদন 'A spokesperson told us Chinese is among the top 10 languages sold with a huge increase over a one year period from 2008 to 2009 in corporate sales, an increase of 719 percent'.

নিজেদের ভাষায় বিজ্ঞান থেকে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজালে যে সুবিধা পাওয়া যায়, তার পুরোটাই চীন পাচ্ছে। ফলে বটেই, তাদের বেচার মতো মাল দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক যোগ্য ছাত্রও তারা তৈরি করছে। উভয় প্রয়োজনেই বিদেশি ভাষা তাদের শিখতে হতেই পারে। কিন্তু যখনই চীনারা এই যোগ্যতা অর্জন করল, বাকি দুনিয়া বহু গুণ বেশি হারে চীনা ভাষা শিখতে বাধ্য হচ্ছে, আগে যেখানে একাডেমিক বা বিদ্যায়তনিক আগ্রহ ছাড়া খুব কম মানুষই চীনা ভাষার মতো দূরগ্রহের ভাষা শিখতে উৎসুক হতো।

আমরা কি ভিন্ন ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে : তাহলে কি ইংরেজি ভাষা আপনারা শিখতেই দেবেন না?

না, একদমই না। বরং দেখা যাবে, যেসব দেশ মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চাকে প্রসারিত করেছে, সবগুলোতেই সীমিত সংখ্যার শিক্ষার্থী বিদেশি ভাষার মানসম্পন্ন চর্চা করছে। এবং সেখানে শুধু ইংরেজি না, অন্য আর সব ভাষায় পারদর্শী অসংখ্য মানুষ তৈরি হচ্ছে। জার্মান, স্প্যানিশ, ফরাসি, আরবি, ফারসিসমেত আরো বহু ভাষায় নিত্যনতুন জ্ঞান তৈরি হচ্ছে , ইংরেজির আয়োজনের বিপুল ব্যয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকায় সেগুলোর দিকে তাকানোর সময় আমাদের নেই। বলা হয়, আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, নিজেদের ইতিহাসের বহু বাঁক এখনো অন্ধকারে। সেখানে আলো পড়বেই না, যদি ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, পালির বহু টেক্সট অনূদিত না হয়। আরো বহু ভাষার দোভাষী সেই দেশগুলোর সাথে আমাদের আর্থিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে। স্প্যানিশ থেকে রাজু আলাউদ্দীন, রফিক-উম-মুনীর চৌধুরীরা প্রত্যক্ষ অনুবাদ করছেন, তাঁদের ওই ভাষা শেখাটা বরং কিছুটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঘটেছে। দ্বিভাষিক করার যন্ত্রণা থেকে জাতিকে ব্যতিব্যস্ত না করলে যে বিপুল ব্যয় রক্ষা পাবে, সেটার সামান্য অংশ ব্যবহৃত হতে পারবে সমাজে আরো বহু ভাষার শিক্ষার প্রচলনে।

আমাদের দেশের এই একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি যে, এক বাঙালি তাঁর আরেক বাঙালি 'কলিগের' সাথে দুর্বল ইংরেজি পত্র লেখেন। যে ছেলেটা বা যে মেয়েটা এইট পাস করে কৃষিতে শ্রম দেবেন, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা গণিতের জ্ঞান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় চেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি ধস্তাধস্তি তাঁকে করতে হয়েছে ইংরেজির সাথে। তাঁর পেশা, জীবন–কোনো কিছুর সাথেই ইংরেজির আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। শিক্ষাজীবনেরই একটা বিরাট সময় ব্যয় হয় ইংরেজির হেস্তনেস্ত করার বৃথা আয়োজনে। এই পরিস্থিতির কারণ ইংরেজিকে

একটা যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা, ফলে শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে বাংলাকরণের সাথে সাথে ইংরেজির এই আধিপত্যকে তুলে নিতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যেকোনো পরীক্ষায় ইংরেজিকে শর্ত হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য করতে হবে পেশাদার দোভাষীর ব্যবস্থা করতে। এই দোভাষীদেরও বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আরো নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান শিক্ষণ দেবে, সেটা দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা ও স্বল্পমেয়াদি উভয় ধরনেরই হতে পারে। রয়্যালটি, অনুবাদকের পেছনে ব্যয়, ছাপার খরচ ইত্যাদি বাবদ যে বিপুল খরচের কথা ভাবছেন, সেটা যে অর্থ বেঁচে যাবে, তার ভগ্নাংশেই সম্পন্ন করা সম্ভব; শুধু প্রয়োজন এইটুকু স্বপ্ন দেখতে শেখা।

পেশাগত সাফল্য বনাম সৃজনীক্ষমতা

দুনিয়ার নানা দেশে পদার্থবিদ্যা নিয়ে কাজ করছেন এমন বন্ধুদের যখন মেইল করলাম, তাঁদের অনেকেরই একই কথা, বাংলায় ভাবনা করি, কিন্তু ইংরেজিটা জানা থাকলে প্রতিযোগিতায় সুবিধা। আমি দেখলাম, অনেকেই একটা পূর্ব চিন্তায় আচ্ছন্ন : ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ কি কেড়ে নেওয়ার কথা হচ্ছে! তাঁরা কেউই মনে করেন না বাংলায় চিন্তা করতে তাঁদের সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু বিদেশে পেশাগত সাফল্যের মাপকাঠিতে দেশের হাজার হাজার বিজ্ঞানপড়ুয়ার সৃজনীশক্তির বিকাশ বাধাগ্রস্ত করার প্রশ্নটি উপেক্ষা করা যায় না।

চীনপ্রবাসী বিজ্ঞানীর উদাহরণ শুনেছি কারো কারো কাছে, তাঁরা নাকি তাঁকে দুঃখ করে বলেন যে বাঙালিরাও ভাগ্যবান, কারণ তারা ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখতে পেরেছে! অথচ এটা খুবই সম্ভব যে, যে প্রবাসী চীনা বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ তাঁরা পেয়েছেন (যদি ব্যক্তিগতভাবে এই চীনা বিজ্ঞানী সাবেকি জমিদারনন্দন না হয়ে থাকেন), তিনি খুবই অকৃতজ্ঞ, এবং কৃতজ্ঞচিত্তের অভাব সব দেশেই কমবেশি আছে। চীনা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ভিত্তিস্থাপন না ঘটলে প্রচলন না ঘটলে খুব কম চীনদেশীয় ভদ্রলোকই বিজ্ঞানচর্চার আদৌ সুযোগ পেতেন। যে চীনা বিজ্ঞানীদের আমরা প্রবাসে দেখছি, তাঁরা চীনা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ফলে যে বিশাল বিজ্ঞানীসমাজ চীনে তৈরি হয়েছে, তারই উপচে পড়া একটা অংশ, এই উপচে পড়াদেরও পরিমাণ ও মান এত ভালো যে, ইংরেজি ভালো না জানলেও বিজ্ঞানী হিসেবে সারা দুনিয়ার ল্যাবে তাঁদের কদর, বিদেশে গিয়ে সেই ভাষাগুলো তাঁরা কষ্ট করে শিখে নেন। এঁদের অনেকেই জীবনের তরে বিদেশগামী, কেউ কেউ হয়তো ফিরে আসবেন। কিন্তু এই উপচে পড়াদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে চীনে কর্মরত, গবেষণারত কোটি কোটি প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীর ওপর ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দেওয়াটা হতো দেশের স্বার্থের সাথে প্রতারণা, গুটিকতকের স্বার্থে। কাজেই কোনো প্রবাসী চীনা যখন তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ প্রকাশ করেন, তাঁকে বরং স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বাংলাভাষী বাঙালি কিংবা হিন্দিভাষী ভারতীয় চীনদেশের তুলনায় অন্তত এক শ বছর আগে পেলেও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পাওয়ায় বাংলাদেশ-ভারতের তুলনায় তাঁর দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার মান ও হার উভয়টিই বেড়েছে।

শুধুমাত্র উচ্চবিত্তরা বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত থাকলে বড়জোর কিছু কর্পোরেট প্রকৌশলী আমরা পেতে পারি, কিন্তু দেশের জনগণের কাজে লাগবে এমন প্রযুক্তিবিদ পাওয়া দুষ্কর হবে, যেমনটা হচ্ছে বাংলাদেশে।

আগে আসে খনিকার, তারপর মণিকার!

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মনে করতেন, যেকোনো ভাষায় আগে প্রয়োজন খনিকারের শ্রম, তারপর উদয় হবে সেইসব মানুষের, যাঁরা সেই ভাষায় শিল্পের বাগান সৃজন করবেন। যেকোনো ভাষায় 'আগে আসে খনিকার, তারপর মণিকার' তাঁর সাফ কথা। বাংলা ভাষায় খনিকাররা জীবনপাত শ্রম দিয়েছেন অনেকেই, তাঁরা ভাষার হৃদয়াভ্যন্তর থেকে খুঁড়ে এনেছেন রাশি রাশি মহামূল্য আকরিক, পাথর কেটে মুক্ত করেছেন অজস্র রুদ্ধ ঝরনাস্রোতকে। শুধু কি কবি হিসেবে! রবি ঠাকুর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বিজ্ঞানের বহু শব্দের পরিভাষা তৈরি করার জন্য। তাঁর বহু পরিভাষা গৃহীত হয়নি, অনেকগুলোই আমরা অকাতরে ব্যবহার করছি। তাদের এই কাজটি শুধু যে শ্রমিকের সৌন্দর্যহীন শ্রম, তা বলার মতো দুঃসাহস বোধ করি কেউ দেখাবেন না। বাংলা ভাষার উদ্যানে তাঁদের ভাস্কর্যকর্মও নিতান্তই কম নয়। উচ্চচিন্তার যে চর্চা মাতৃভাষায় তাঁরা শুরু করেছিলেন, তার দুয়ার রুদ্ধ হয়েছে।

পাকিস্তান আমলে জাতীয়তাবাদী আলোড়নের প্রয়োজনে, মধ্যবিত্তের রাজনীতিতে জনগণের বাকি অংশকে টেনে আনার প্রয়োজনে এবং শাসকদলের প্রতি ক্ষোভকে প্রকাশ করার জন্য বাঙালি মুসলিম নতুন করে বাঙালি হওয়া শুরু করে; কিন্তু মধ্যবিত্ত স্বার্থ যে কতটা বিচ্ছিন্ন স্বার্থ, সেটা বোঝা যায় ক্ষমতা নিজের হাতে পাওয়া মাত্র স্বাধীন বাংলাদেশে তার মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত পাঠদানের ব্যবস্থা না করে খুব দ্রুতই পুরনো ভাষা-আধিপত্যের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করায়। সমাজের ক্ষমতা/চাকরি/বিত্ত/মর্যাদার প্রতিযোগিতায় দুর্বলতরদের বিরুদ্ধে ইংরেজিজ্ঞান পরিণত হলো বিশাল এক হাতিয়ারে। নিউটন কিংবা আইনস্টাইন অথবা হার্ভে–বিজ্ঞানীদের জন্ম শুধু সেই সমাজগুলোই দিয়েছে, যে সমাজে মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা হয়। শুধুমাত্র উচ্চবিত্তরা বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত থাকলে বড়জোর কিছু কর্পোরেট প্রকৌশলী আমরা পেতে পারি, কিন্তু দেশের জনগণের কাজে লাগবে এমন প্রযুক্তিবিদ পাওয়া দুষ্কর হবে, যেমনটা হচ্ছে বাংলাদেশে। তারও বেশি ঘটবে প্রতিভার অপচয়। পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তর ঘটার মতো প্রতিভা নিয়ে কেউ হয়তো তার বিদেশি ভাষার প্রতিবন্ধকতার জন্য পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদেরই একজন হয়ে উঠছে।

আবেগ'টাবেগ'

ভাষা বিষয়ে আবেগাক্রান্ত কথাবার্তা সাধারণত পরিহার করা ভালো। আমি সমাজের বিকাশ বিষয়ে আগ্রহী, এবং তার জন্য ইংরেজি উর্দু হিন্দি আরবি ফারসি–যেকোনো ভাষা শিক্ষা গ্রহণের খুবই পক্ষে। কিন্তু ফল হলো এই, যদি মাতৃভাষায় শিক্ষার একটা ভিত্তিস্থাপন করা না যায়, তাহলে যোগ্যতম ছাত্ররা দলে দলে বাদ পড়বে, পড়াটা আর তাদের হবে না। দ্বিভাষিক জাতি গঠনের কথা বাদ, যে বিপুল ব্যয়ে আমরা মাঝারি মানের ইংরেজি জানা জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারছি না, পারা সম্ভবও নয়, তার তুলনায় অনেক কম ব্যয়ে আমরা মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করতে পারতাম, কিংবা জনগণের মাঝে সেই চেতনা জেগে উঠলে ভবিষ্যতেও তা পারব।

তার পরও, একটা কথা বলা দরকার, 'বাংলা ভাষা বাঙালির চৈতন্যের অধিষ্ঠান'–এই দার্শনিক উপলব্ধিটা যেকোনো ভাষার জন্য সত্য। জটিল জাপানি বর্ণমালা শিখে একজন শিশু জাপানি হয়ে ওঠে, আরব শিশুও তা-ই। ভাষাকে উচ্চতর বিজ্ঞানের সংস্পর্শচ্যুত করলে তার খোলসটুকু শুধু বাকি থাকে, 'ভদ্রলোকেরা' তাতে কেবল শুদ্ধ রবীন্দ্রচর্চা করেন, 'অভদ্রলোকেরা' বাধ্য হয়ে তা আঁকড়ে থাকেন। কিন্তু ভাষাটার প্রাণ শুকিয়ে আসতে থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি বক্তৃতা

উদ্ধৃত করে প্রমথ চৌধুরী তাই বলেছিলেন, *"ভাষা যদি শুধু সুকুমারবৃত্তির বাহন হয়, কিন্তু শিক্ষা অথবা রাজকর্ম–এইসব চলতে থাকে আরেক ভাষায়, সেই ভাষায় এমনকি উচ্চমাপের সাহিত্যও সৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। বাস্তব জীবন থেকে ভাষাকে তাই কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা চলবে না।"*

অনেকেই মাঝামাঝি একটা রাস্তার কথা বলেন : ঠিক আছে, সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষা হোক বাংলায়, উঁচুমাপের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শুধু ইংরেজি বরাদ্দ রাখা হোক। এটাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিভাজনটিকে মোলায়েমভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টাই। এর অন্তর্নিহিত ভাবনাটা এই যে, বাংলা ভাষা উচ্চস্তরের ভাব প্রকাশে সমর্থ নয়। ঐতিহাসিকভাবে এটা কেন ভুল, সে আলোচনা এতক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু স্রেফ শিক্ষণবিজ্ঞানের দিক দিয়ে চিন্তা করলেও বিষয়টা মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ। প্রবাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী দীপেন ভট্টাচার্যের একটি লেখায় তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষার এই গুরুতর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন, সেটার আলোকেও বলা যায়, কারো মাতৃভাষা (প্রথম ভাষা বা এল ওয়ান), যেটা শিশু শেখে শৈশবে, সেটা তার মস্তিষ্কের বাম অংশে ঘনীভূত থাকে। অন্যদিকে চর্চা করে শেখা ভাষাটি (দ্বিতীয় ভাষা বা এল টু) ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে তার মস্তিষ্কের নানা অংশে। ফলে সহজাতভাবেই সে প্রথম ভাষাতেই সৃজনশীলতর চিন্তা করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে ইংরেজিকেও একই রকম প্রথম ভাষায় পরিণত করতে যে বিপুল ব্যয়, সামাজিক সম্পৃক্তি আর দক্ষযজ্ঞ করতে হবে, সেটার ধারণা ওপরে কিঞ্চিৎ দেওয়া হয়েছে।

ভাষা মানে কতগুলো শব্দের সমষ্টি নয় কেবল। বিজ্ঞানের বইগুলো সাধারণভাবে অপাঠ্য, ফারসীম মান্নান মোহাম্মদীর এই সমালোচনার সাথে একমত না হয়ে উপায় থাকে না। সুপাঠ্য করার জন্য ফারসীম একটা উদাহরণ হিসেবে প্রস্তাব দিয়েছেন ধাতব দণ্ডের বদলে রড ব্যবহার করলে সেটা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর জন্য সুবিধাজনক হবে। বিজ্ঞানের বইগুলো খুবই অপাঠ্য হয়, সেগুলোর বাক্যগুলোর গঠনপ্রণালী একদম খোলনলচে পাল্টে দেওয়া দরকার, এ নিয়ে ফারসীমের সাথে মতদ্বৈধের কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই যে 'দণ্ড' শব্দটি শেখা, তার সাথে ন্যায়দণ্ড, বংশদণ্ড, দণ্ড ও সামনীতি, বেকুবির দণ্ড (খেসারত অর্থে), কারাদণ্ড, দণ্ডধারীসমেত আরো অজস্র শব্দের সাথে অচেতন সম্পর্কের ক্রিয়া, না চাইতেই যা অর্জিত হয়, তার কী হবে? গো শব্দজাত গবাদির সাথে যে গোপিনী রাধিকার বংশপরিচয় লুকিয়ে আছে, সেটা কি শিক্ষার্থী আর বুঝতে পারবে? মাতৃভাষায় শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসলে একজন শিক্ষার্থী ওই ভাষার নাগরিক হয়ে ওঠে, সে তার ইতিহাসের সাথে, ঐতিহ্যের সাথে গেঁথে যায়। 'বাঙালির অধিষ্ঠান বাঙালির ভাষা'–এই অভিজ্ঞতাটি সকল মাতৃভাষার জন্যই সামান্যীকৃত সত্য।

সাম্প্রতিককালে দেশে বিজ্ঞানচর্চার সংস্কৃতিকে কিছুটা হলেও ফেরত এনেছে পদার্থবিদ্যা, গণিত অলিম্পিয়াডের মতো আয়োজনগুলো। *"গণিত অলিম্পিয়াডে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যে কীভাবে বাংলায় লেখা বই চায়!"*–খনিকার এক বন্ধুর এই হাহাকারের মাঝে শুধু আবেগই নেই, আমাদের জাতীয় দায়িত্বটা কী, সেই নির্দেশনাও আছে। আজকে যাঁরা খনিকারের ভূমিকা নিয়ে ভবিষ্যৎ মণিকারদের পথ তৈরি করে নিচ্ছেন, এই মুহূর্তে তাঁরা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজটিই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

"গণিত অলিম্পিয়াডে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যে কীভাবে বাংলায় লেখা বই চায়!"–খনিকার এক বন্ধুর এই হাহাকারের মাঝে শুধু আবেগই নেই, আমাদের জাতীয় দায়িত্বটা কী, সেই নির্দেশনাও আছে।

বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার জটিলতা

বছর কয়েক আগে একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যার ডেইলি স্টারে ÔDoing science in Bangla' নামে মুহম্মদ জাফর ইকবাল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে প্রকাশ করার যে সমস্যাটি চিহ্নিত করেছেন, তা এখানকার মূলধারার অনেকেরই মতামত প্রতিফলিত করে। ঝটপট অনুবাদে তাঁর রচনাটি থেকে কিছু অংশ তুলে দিই :

"এবারে একই রকমের একটা উদাহরণ নেয়া যাক একটা বিজ্ঞানের পাঠ্যবই (রবার্ট রেসনিক ও ডেভিড হ্যালিডে রচিত পদার্থবিদ্যা–স্নাতক শিক্ষার বছরগুলোতে এই বইটিই আমি পড়েছি) থেকে। যথাইচ্ছা একটা বাক্য বাছাই করি : 'We can show that there are two kinds of charge by rubbing a glass rod with silk and hanging it from a long thread as in fig. 26-1'. আমি নিশ্চিত যে এই বাক্যটার অর্থ প্রায় সবার কাছেই স্থির, এমনকি বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী নন এমন যে কারও কাছেও। বাক্যটা এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে, আমরা তথ্যগুলো সঠিক ধারাক্রমে পাই। প্রথমত এটা বলে যে (১) দুই ধরনের আধান আছে, তারপর (২) এটা নির্ণয় করার জন্য যে পরীক্ষণটি করা যেতে পারে এবং তারপর (৩) যদি বা কারো কাছে পরীক্ষণের বর্ণনাটি যথেষ্ট বলে মনে না হয় তার জন্য একটা চিত্রের বরাত উল্লেখ।

"এবার আমি একই তথ্যগুলো বাংলায় দেয়ার চেষ্টা করবো। সেটা করার একটা সুনিশ্চিত উপায় হলো বাক্যটিকে বাংলায় অনুবাদ করে ফেলা, এবং খুব দ্রুতই আমি আবিষ্কার করলাম যে কাজটা খুব সোজা না। এটাকে একটা বাক্যে সীমিত রাখতে চাইলে সবচে ভালো যে অনুবাদটি আমি করতে পারি সেটা হলো : 'একটা কাঁচের দণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘষে ২৬-১ ছবিতে দেখানো উপায়ে একটা লম্বা সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে আমরা দেখাতে পারি যে চার্জ দুই রকমের।' আপনারাও চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এর চেয়ে খুব ভাল কিছু করতে পারবেন না। বাক্যটা ঠিকই আছে, কিন্তু তথ্যগুলো ধারাক্রমে গুবলেট পাকিয়েছে–তথ্যগুলো যথাযথ ক্রমানুসারে আসেনি। আমি যদি এটা ঠিকমত করতে চাই এবং একইসাথে বাক্যটাকে সরলও রাখতে চাই তাহলে আমাকে বাক্যটাকে ভেঙে তিনটি আলাদা বাক্য বানাতে হবে, যেমন (১)আমরা দেখাতে পারি যে চার্জ দু রকমের। (২) একটা কাঁচের দণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘষে একটা লম্বা সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে সেটা দেখানো যায়। (৩) ২৬-১ নম্বরের ছবিতে সেটা দেখানো হয়েছে। এবার ভাষা সরল এবং বোধগম্য হয়েছে–কিন্তু আমাকে আকৃতি বিষয়ে ছাড় দিতে হয়েছে, পাঠ্যবস্তু এখন তাৎপর্যপূর্ণ রকমের বড়সড়।

"আমি এই সমস্যাটি নিয়ে আগে সচেতন ছিলাম না। বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যবই পড়তে গেলে সর্বদাই আমি ভাষার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করি–এটা কখনোই সরল না, কখনোই সরাসরি না–সব সময়েই ভাষাটা একটু জটিল। ভেবেছিলাম বিজ্ঞান লেখকদের ভাষা নিয়ে পর্যাপ্ত দখলের অভাব আছে। বছর কয়েক আগে আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পদার্থবিজ্ঞানের একটা পাঠ্যবই বাংলায় লিখতে শুরু করি এবং সাথে সাথেই আমি সমস্যাটা বুঝতে পারি। আমি উপলব্ধি করি, কবিতা রচিবার তরে বাংলা একটা সুন্দর ভাষা কিন্তু বিজ্ঞান লেখার জন্য একটু কঠিন। আমি জানি না কেন বা

কিভাবে এটা ঘটলো, কিন্তু এটা সত্যি।" (Muhammed Zafar Iqbal, Doing science in Bangla, Sat, February 21, 2004, The Daily Star).

না, এটা সত্য নয়। কারণ বাংলা বা আর কোনো ভাষার ক্ষেত্রে এমন কোনো অক্ষমতার কোনো কারণ ঘটেইনি, ঘটার সুযোগও কম। বরং আমরা আশ্চর্য হই বাংলা ভাষায় জনপ্রিয়তম কল্পকাহিনীর লেখক কেন আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটির ওই নির্দিষ্ট বাক্যটির এমন আড়ষ্ট তর্জমা প্রস্তাব করে তারপর সেটির দায়ে বাংলা ভাষার অক্ষমতাকে শাস্তি দেওয়ার মনস্তাপে ভুগছেন। বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্য হবার জন্য যদি বাক্যটার অনুবাদ এমন একটা কিছু হতে হবে, যেটা বোধগম্য এবং যথাযথ ক্রমানুযায়ী তথ্যগুলো সাজানো, তেমন একটা বিকল্প তর্জমা তো এক্ষুনি চেষ্টা করে দেখানো যেতে পারে, "আধান যে দুই রকমের তা দেখানো যেতে পারে একটা কাচের দণ্ডকে রেশমি কাপড় দিয়ে ঘষে সেটাকে একটা লম্বা সুতায় ঝুলিয়ে যেমনটা দেখানো হয়েছে ২৬-১ চিত্রে।" প্রস্তাবিত বাক্যটিতে আশা করি অর্থগুলো নিশ্চিত, তথ্যগুলোও সম্ভবত বিদ্যুতের ধর্ম শিক্ষার উপযুক্ত ক্রমেই একের পর এক এসেছে। এমনকি নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় যে, এই বাক্যটিকে আরো সাবলীল, মজার ও কার্যকর করে উপস্থাপনের মতো জ্ঞানী মানুষ আমাদের আশপাশে অনেকই আছেন।

'ডুয়িং সায়েন্স ইন বাংলা' নামের এই প্রবন্ধটিতে তার পরও মুহম্মদ জাফর ইকবালের বাংলাপ্রেম স্পষ্ট। মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখছেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' এই বাক্যটা ইংরেজিতে মাত্র একভাবেই বলা যেতে পারে, কিন্তু বাংলায় শব্দগুলো যেভাবেই সাজান না কেন, তা শুদ্ধ হবে। তার পরই জানাচ্ছেন অপারগ রায়টি, এ কারণেই হয়তো বাংলায় কবির সংখ্যা এত বেশি, কিন্তু বিজ্ঞান হওয়াটা কঠিন। মুহম্মদ জাফর ইকবাল আজকে না হলেও অতিদূর ভবিষ্যতে একদিন বাংলা ভাষার বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা ওই লেখাতেই বলেছেন:

"আমার ধারণা আমরা বিজ্ঞানের বই লেখার জন্য বাংলা ব্যবহার করিনি এবং ভাষাটিও বিজ্ঞানকে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করার জন্য এখনও প্রস্তুত নয়। তাই যতবার আমরা বাংলায় বিজ্ঞান করতে যাই, বইগুলোর ভাষা জটিল এবং বিস্তারিত হয়ে যায়। আমার মনে হয় না এই সমস্যার কোন সরল সমাধান আছে। অনন্যোপায় একমাত্র সমাধানটি শ্রমসাধ্য এবং সময়ক্ষেপক। বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করে বিজ্ঞানগ্রন্থ লেখা চালিয়ে যেতে হবে এবং খুব ধীর গতিতে আমাদের ভাষা বিজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে।"

মুহম্মদ জাফর ইকবালের প্রবন্ধের এই অংশটি ইংরেজিতে পাঠ করতে গেলেও পাঠক সম্ভবত লেখকের মনের দ্বিধাটি ধরে ফেলবেন। বর্তমানে বাংলা যদি বিজ্ঞানের উপযুক্ত না হয়ে থাকে, সেটাকে বিজ্ঞানের উপযুক্ত করতে গেলে যদি এতদিন পরও দূর ভবিষ্যতে বহু বহু চর্চার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে আজ কিংবা অদূর ভবিষ্যতে যারা বিজ্ঞান পড়বে, তাদের কী হবে? সমাধান তারা ইংরেজিতেই বিজ্ঞান করবে। এবং ক্রমাগত ইংরেজিতেই যদি আমরা বিজ্ঞানে (এবং আর সবকিছুতে) উচ্চশিক্ষা দিতে থাকি, সমাজে কি ইংরেজিভাষীদের একটা দখলদারিত্ব ও প্রভুত্ব সৃষ্টি হবার কথা নয়, যারা নিজেদের সুবিধার জন্য ভাষার এই আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে চাইবে, এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী ও শিক্ষাব্যবস্থায় করে ফেলবে? বস্তুত সেটাই ঘটেছে, এবং ফলে বাংলায় বিজ্ঞান বা আর কোনো উচ্চতর গ্রন্থ রচনা মরুভূমিতে পানি ছিটানোর মতো নগণ্য পর্যায়ে চলে গেছে।

অথচ এই ধারণার সারবত্তা নিয়েই তো কথা ওঠা উচিত। কিছু সীমাবদ্ধতা হয়তো আছে, তার পরও বাংলা বিজ্ঞানের জন্য এখনো উপযুক্ত না–এই সিদ্ধান্তটি নেওয়ার জন্য মুহম্মদ জাফর ইকবালও যে যথাযথ ব্যক্তি নন, সেটা আমরা বর্তমান রচনার দ্বিতীয় পর্বেই তো দেখিয়েছি, যেখানে তিনি যথাযথ অনুবাদে ব্যর্থ হয়েছেন নিজেই। আরেকবার তাড়াহুড়োর কারণেই হয়তো তিনি লেখাটির এক স্থানে 'চার্জ'-এর বাংলা করেছেন বিভব এবং বলেছেন, কেন সারা জীবন চার্জ বলতে হবে এমন একটা কিছুকে পদার্থবিদ্যার ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে 'বিভব' নামে শিখবে? বটেই, বিভব নামে নয়, চার্জ-এর যথাযথ বাংলা 'আধান' হিসেবেই শেখানো দরকার শিশুদের। 'বিভব' শিখুক তারা পটেনশিয়ালের বাংলা হিসেবে। এই আধান কিংবা বিভব শব্দগুলোর বিশেষ মহিমা আছে, সেগুলোও শিখুক। এমনকি রড-এর বাংলায় রডই চালু হলেও শিখুক দণ্ডই; এবং রাজদণ্ড, বোকামির খেসারত হিসেবে দণ্ড, শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ডসহ বাংলা ভাষায় দণ্ডের আরো অজস্র ব্যবহারের তাৎপর্য নিয়ে সচেতন হোক, অন্তত অচেতনে অভ্যস্ত হোক। ভাষা হলো জাতির চৈতন্যের বাহন, এ কারণেই চীনা, কোরীয়সহ আরো যারা আমাদেরও বহু পরে পশ্চিমা জ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়েছে, তারা যথাসম্ভব প্রতিটা শব্দের নিজস্ব প্রতিশব্দ বানিয়ে নেয়। আমাদের দেশেই বোধ করি পরিচিত পরিভাষাগুলো ব্যবহার না করার আর অর্ধপরিচিতগুলোকে চালু করার চেষ্টা না করে ঝেঁটিয়ে দেওয়ার এই তোড়জোড় শক্তিশালী।

> এই কাজটিই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর করার কথা। সেখানে যেমন আছে (বা থাকার কথা ছিল) বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, তেমনি ভাষাবিদ। তেমনি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের সম্মিলিত যৌথ প্রয়াসে নিমেষেই আপনার-আমার চালু বাংলায় আইনের কিতাব রচনা সম্ভব; গণবোধ্য না হোক, উৎসুকদের জন্য বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তক রচনা সম্ভব। এইটুকু প্রস্তুতি বাংলা ভাষার বহু আগে থেকেই আছে।

তবে সত্যি সত্যিই এই সংকটের কালটা আমাদের ছিল উনিশ শতকে, এবং আমাদের পূর্বসূরিরা আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শনের মুখোমুখি হয়ে এই সংকটকে অনেকখানিই অতিক্রম করেছেন তাঁদের হিমালয়সদৃশ নির্মাণযজ্ঞ দিয়ে। কিন্তু ওই উনিশ শতকেও কারো বাংলাকে বিজ্ঞানের অনুপযুক্ত বলাটা যথাযথ হতো না, বড়জোর সংকটটা চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করা যেতে পারত। কেননা তাঁরা যে পেরেছিলেন, তারও একটা পূর্বপ্রস্তুতি আগে থেকেই হয়েছিল কবিতা, দর্শন আর জ্ঞানচর্চার ধারায়। ঔপনিবেশিক নীতিনির্ধারকরা বরং বরাবরই আগ্রহী ছিল প্রভুদের ভাষাতেই উচ্চশিক্ষাকে চাপিয়ে দিতে। ফলে সমাজ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের উপযুক্ত হলেও অন্য বাস্তবতায় তা করা সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশরা চলে গেছে বটে, কিন্তু তাদের সৃষ্ট মধ্যবিত্ত স্বার্থ আজও অটুট শুধু নেই, স্বদেশবাসীর ওপর নিজেদের সুবিধাগুলো সাধ্যমতো চাপিয়ে দিয়ে বিভাজনটাকে আরো তিক্ত করেছে। ভারতবর্ষ জুড়ে আঞ্চলিক বিরোধকে ধামাচাপা দেওয়ার মাধ্যম হিসেবেও ইংরেজি কাজ করেছে, এতে হিন্দি-উর্দুর বাইরে কোনো স্থানীয় ভাষাই যেন আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, তার জন্য উচ্চশ্রেণির যোগাযোগের মাধ্যম করা হয়েছে ইংরেজিকে। উপনিবেশের আমলে স্বার্থের সংঘাত আর জাতীয়তাবাদী চেতনা মধ্যবিত্তকে বাধ্য করেছিল সাধারণ মানুষের কাছে যেতে। আর আজ সেই মধ্যবিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করছে এই সাধারণ মানুষকেই দমন

করতে, অজ্ঞ বানিয়ে রাখতে। মধ্যবিত্ত সচেতন ও অচেতন নানা প্রয়াসে তাই দেখা যাবে নিজের সামাজিক সুবিধাটি টিকিয়ে রাখতে সর্বত্র ইংরেজির আধিপত্যকে জারি রাখার চেষ্টা।

দায়িত্ব কার?

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আইনের ভাষা নিয়ে বিশেষ হাসাহাসির চল আছে। যে ভাষায় ওই পাঠ্যপুস্তকগুলো রচিত, তাতে এই পরিহাস অসংগত নয়। কিন্তু এ কারণে শিক্ষার্থীদেরও একটা বড় অংশের ধারণা হয়েছে যে, মানসম্পন্ন আইন শিক্ষা বাংলায় সম্ভব নয়, অথবা বাংলা অকারণ জটিল। অথচ যেকোনো যথাযথ বাংলা জানা লোক আইনের পুস্তকগুলো হাতে নিলে বুঝবেন, ওই কিতাবগুলো যাঁরা লিখেছেন তাঁরা আইন যা-ই জানুন, বাংলা আদৌ জানেন না। এর ভাষা এতটা বিভীষিকাময় বলেই আধো আধো ইংরেজি জানা শিক্ষার্থীও এই ভীতিকর বাংলা পড়ার চেয়ে ইংরেজিতে মুখস্থ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। মোটামুটি ইংরেজি জানা অংশটা এইভাবে বাড়তি সুবিধা পান শিক্ষাগত ও পেশাগত জীবনে, এবং সংগত কারণেই সেটা টিকিয়ে রাখাই তাঁর স্বার্থ হয়ে দাঁড়ানোর কথা। আর সব বিষয়েও পাঠ্য বইগুলোর একই দশা। তাহলে কে উদ্যোগ নেবেন বাংলায় বইগুলো লেখার?

এই কাজটিই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর করার কথা। সেখানে যেমন আছে (বা থাকার কথা ছিল) বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, তেমনি ভাষাবিদ। তেমনি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের সম্মিলিত যৌথ প্রয়াসে নিমেষেই আপনার-আমার চালু বাংলায় আইনের কিতাব রচনা সম্ভব; গণবোধ্য না হোক, উৎসুকদের জন্য বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তক রচনা সম্ভব। এইটুকু প্রস্তুতি বাংলা ভাষার বহু আগে থেকেই আছে। আমরা কি জানি, আশির দশকেই ভাষাসৈনিক আহমদ রফিকের নেতৃত্বে একটা দল চিকিৎসাবিজ্ঞানের দু-দুটো পাঠ্যপুস্তক বাংলায় তর্জমা করেছিল? চিকিৎসাবিদ আর সাহিত্যামোদীদের যৌথ প্রয়াসের একটা অনন্য দৃষ্টান্ত ছিল সেটা। ভাষা আন্দোলন আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রকাশ তো আসলে এই-ই। সেই অনুবাদের ভাগ্যে ঘটেছিল করুণ এক পরিণতি, আমাদের আরো বহু কিছুর মতোই। চিকিৎসা শিক্ষার কর্তৃপক্ষ সেটাকে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদন দিতে অসম্মত হয়। আমরা আরো বহু বছরের জন্য থেকে যাই সেই হতভাগা দেশগুলোর একটাতে, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রধানত মুখস্থ করে এবং সামান্যই আত্মস্থ করে চিকিৎসক হন।

> পরিভাষা অনুবাদের বিপদ নিয়ে একই রকম গুরুতর গলতির কথা বলেছেন পল সুইজি, ইংরেজিতে মার্ক্সের প্রিমিটিভ অ্যাকুমুলেশন শব্দটার বদলে নাকি করা উচিত ছিল অরিজিনাল অ্যাকুমুলেশন। দুটোর ভাবের পার্থক্য বিস্তর।

সমাজে-রাষ্ট্রে এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে কি না, তার লক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়েই পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গঠনমূলক ভূমিকা লক্ষ করেছিলেন, তিনি লেখেন :

"এককালে হঙ্গেরীয় ভাষা ও সাহিত্য নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্যস্ত হইয়া লাটিন ও জর্মানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। এমন-কি, ১৮৪৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হঙ্গেরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন এবং জর্মান ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই সময় গুটিকতক দেশানুরাগী পুরুষ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অবমানে ব্যথিত হইয়া ইহার প্রতিকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। আজ তাঁহাদের কল্যাণে হঙ্গেরিদেশে এমন ভূরিপরিমাণে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে যে, প্রজাসংখ্যা তুলনা করিলে য়ুরোপ জর্মনি ব্যতীত আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানশিক্ষাশালা নাই এবং সেই-সকল পাঠাগারে কেবলমাত্র হঙ্গেরিভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই পরিবর্তনসাধনের জন্য হঙ্গেরি মৌরস য়োকাইয়ের নিকট ঋণে বদ্ধ। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে হঙ্গেরি যখন বিদ্রোহী হয় তখন য়োকাই কেবল যে লেখনীর দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে স্বয়ং তরবারিহস্তে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শান্তিস্থাপনের সময় তিনিই বিপ্লবের বহ্নিদাহ নির্বাপণে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন...বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা যে এই দুই হঙ্গেরীয় ও পোলীয় লেখকের উল্লেখ করিলাম তাহার কারণ, ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব দেশে এক নব সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা যেমন স্বদেশে সাহিত্যকে গতিশক্তি দিয়াছেন তেমনি তাহার চলিবার পথও স্বহস্তে খনন করিয়াছেন। প্রায় এমন কোনো বিষয় নাই যাহা তাঁহারা নিজে স্বভাষায় প্রচলিত করেন নাই। শিশুদের সুখপাঠ্য মনোরম রূপকথার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস পর্যন্ত সমস্তই তাঁহারা নিজে রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষাকে বিদ্যালয়ে বদ্ধমূল এবং স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের নিজের ক্ষমতা প্রকাশ পায় বটে কিন্তু জাতির সজীবতাও সূচনা করে।"

এবার দেখা যাক, আমাদের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রেখেছে। বইমেলার করুণতম দোকানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নামের প্রতিষ্ঠানটির। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার গ্রন্থতালিকা পাঠে জানা যাবে, ১৯২৬ সালে প্রকাশনা সংস্থা যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত একটিমাত্র বাংলা বই, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনূদিত বাংলা আদব কি তারিখ প্রকাশ করেছিল ১৯৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা। এরপর ১৯৭২ সালে একটি, '৭৮ সালে একটি, এভাবে করে করে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৫৬টি পুস্তকের 'বিশাল বহর' সাজিয়েছে প্রকাশনা সংস্থাটি। অন্যদিকে ইংরেজি বইয়ের বেলায় ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত ১৪টি এবং এখন পর্যন্ত মোট ১০৭টি। দেশের আদিতম বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রকাশনা সংস্থার মোট প্রকাশনা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৯ বছরে ১৬৩টি। এর মধ্যে গোটা বিশেক বইয়ের আবার মুদ্রণ ফুরিয়েছে বছর কয়েক আগে।

পরিভাষা সংকট

পরিভাষার অভাবকে প্রায়ই মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথে বিশাল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখানো হয়। অথচ এই বিষয়গুলো রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন বোসসহ আরো অনেক মহারথী যেভাবে সমাধা করে গেছেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। সামান্য কিছু যুক্ত করে তাঁদের বক্তব্য দিয়েই এ আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।

"অনেক সময় বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বাধা সৃষ্টি করতে পারে বিজ্ঞানচর্চার। আমি বিশুদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজি টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের ছেলেরা যদি ওই শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার-করা শব্দ হিসেবেই তা টিকে থাকবে ও সমৃদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় শব্দভাণ্ডার। গোড়ায় বিদেশী উৎস থেকে উদ্ভূত এমন বহু শব্দ এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই চালু রয়েছে এবং সেগুলি সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও।

আশা করি বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দ এমনিভাবে কাজে লাগানো হবে এবং আমাদের দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাদের রূপান্তর ঘটবে শেষ পর্যন্ত।"

'cognition-এর কী বাংলা তুমি করবা?' বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা হওয়া সম্ভব কি না, সেই প্রশ্নে দুরূহ একটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন ফাহাম আরেকজন প্রখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরীর বরাতে। প্রশ্নটার অর্ধেকটা উত্তর কিন্তু প্রশ্নের ভেতরই লুকিয়ে আছে। বাংলা ভাষা বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং বহু ক্ষেত্রে উচ্চচিন্তার মাধ্যম হিসেবে নগণ্য মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে বাংলাকে অনেক অনেক বেশি বিদেশি পরিভাষা গ্রহণ করতেই হবে, এতে সন্দেহ করার কারণ নেই। কিন্তু একই সাথে বলা দরকার, বিজ্ঞানচর্চার বিকাশের পথেই, সাহিত্যমনা বিজ্ঞানী কিংবা বিজ্ঞানমনা সাহিত্যিক প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটার সাথে সাথে প্রচুর বাংলা পরিভাষাও জন্ম নিতে থাকবে; না জন্ম নয়, বলা উচিত নির্মিত হতে থাকবে। কগনিশন-এর সুন্দর এবং অর্থপূর্ণ বাংলা এই মুহূর্তেই করা সম্ভব, কিন্তু না করা গেলেও বা কী আসে-যায়, সেটাকে সরাসরি ব্যবহার করলেই কি বাংলা ভাষা ইংরেজি হয়ে যায় (বালকদের যেমন ধারণা : ং ঃ যুক্ত করলে বাংলা হয়ে পড়ে সংস্কৃত)!

নিটশের ইতিহাসের দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মিশেল ফুকো তো বরাবর জার্মান পরিভাষাগুলো (ursprung, herkunft, and entstehung) ফরাসিতেও উল্লেখ করেছেন। কারণটা খুবই সংগত, যেমনটা ফাহামও বলেছেন, পরিভাষার পরম্পরা থাকে, ইতিহাস থাকে। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, আরেকটা জাতিকে সেটা আত্মস্থ করার জন্য ওই সমগ্র ইতিহাসটাকে পাড়ি দিতে হয় না, কিছু অসুবিধাসমেত (এই অসুবিধাগুলোকে গুরুত্বহীন ভাবারও কিছু নেই) সেটাকে অন্য আরেকটি ভাষা আত্তীকৃত করতে পারে। পরিভাষা অনুবাদের বিপদ নিয়ে একই রকম গুরুতর গলতির কথা বলেছেন পল সুইজি, ইংরেজিতে মার্ক্সের প্রিমিটিভ অ্যাকুমুলেশন শব্দটার বদলে নাকি করা উচিত ছিল অরিজিনাল অ্যাকুমুলেশন। দুটোর ভাবের পার্থক্য বিস্তর।

"জলে না নেমে সাঁতার শেখানোর দুরাশার মত, ভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার চেষ্টা না করে শুধু পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছে।"

কোনো বিদেশি পরিভাষা আত্তীকৃত করে মাতৃভাষার কৌলীন্য নষ্ট হয় না–এই মত রবি ঠাকুর শখানেক বছর আগে দিয়ে গেছেন। 'কগনিশন-এর বাংলা কী করবা' বাক্যটিতে আবেদ চৌধুরী বাংলায়ই কথা কয়েছেন, যদিও এখানে একটা ইংরেজি পরিভাষা আছে মাত্র। কিন্তু বাঙালি বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কাজ করতে থাকলে অচিরেই বহু বাংলা পরিচিত শব্দ 'বিশেষায়িত শব্দ' হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিভাষায়ও চলে আসবে। 'জীবন বিলম্বিত ধান (জীবধা)' পরিভাষাটি চালু করার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন আবেদ চৌধুরী। তাঁর আরো ইচ্ছা আছে আমাদের দেশজ বাউল পরিভাষার 'দেহতত্ত্ব' শব্দটিকে তাঁর গবেষণার পরিভাষায় ব্যবহার করার। আবেদ চৌধুরীর মতো মহৎ বৈজ্ঞানিকের ব্যবহারে 'বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্ব' শব্দটি যদি একদিন অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীরা উচ্চারণ করতে বাধ্য হন, অবাক হবেন না পাঠক। দিমিত্রি ইভানোভিচ ম্যান্ডেলিফ বাধ্য করেছিলেন বহু ভিনদেশি রসায়নবিদকে রুশ ভাষার মতো তখনকার দিনের একটি ওঁচা ভাষা শিখতে। জাপানি, চীনা বহু স্থানীয় শব্দ এখন বৈশ্বিক পরিভাষা পরিমণ্ডলে আছে। আবার বাংলাদেশে বসেই বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরাও পরিভাষা নির্মাণে পরমুখাপেক্ষী হতে পারেন, সেটা দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-ভাষা-রূপকথা-মহাকাব্য-কবিতা থেকে তার বিচ্ছিন্নতা থেকে কিংবা যাঁরা 'অনুদান' দিচ্ছেন, তাঁদের দিক থেকে প্রণোদনার অভাবে ঘটে। সত্যি, বাঙালি বিজ্ঞানী-ইতিহাসবিদ-সমাজবিজ্ঞানীদের মৌলিক কাজগুলো আজ ইংরেজিতেই সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু এটা দুঃসহ অপমানকরও। এই গবেষণার কাজটি তাঁরা ইংরেজিতে অনায়াসেই করেন বটে, কিন্তু মাতৃভাষায় মৌলিক কাজটি প্রথমে সম্পন্ন করার রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশাল, সেটা তাঁকে ভাষার স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় রাখবে, সেই তাগিদ তাঁরা আজ আর অনুভব করেন না।

কিন্তু কগনিশন-এর মতো শব্দের বঙ্গানুবাদ করার জন্য আমাদের নতুন করে শ্রমব্যয় করতে হবে না। 'অনুধাবন' হলো কগনিশন-এর সুন্দর ও অর্থবহ বাংলা। যদিও বাংলা একাডেমির অভিধানে এর অনুবাদ দেওয়া হয়েছে 'অবধারণ' আর 'বোধ'। এই দুটি শব্দই কগনিশন-এর সম্পূর্ণ অর্থময়তাকে ধারণ করে না, বরং 'প্রসেস অব কগনিশন'-এর বাংলা 'অনুধাবন প্রক্রিয়া' হিসেবেই সবচেয়ে সার্থক হয়।

বস্তুত পরিভাষার প্রশ্নটা একটা সমস্যা, সব ভাষায়ই এটা একসময় ছিল। কিন্তু এটা কোনো ভয়ংকর সংকট নয়, যা কোনো একটা ভাষাকে জ্ঞানচর্চার অনুপযোগী করে তোলে। সমস্যাটা শুধুমাত্র এই যে, অনেকগুলো সম্ভাব্য বিকল্পের মধ্যে কোনো একটি শব্দকে সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশমূলক পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে কিংবা নতুন একটি শব্দ নির্মাণ করতে হবে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বরং এই সমস্যাটা ইতিবাচক শক্তি আকারেই দেখা দিতে পারে। এই নতুন শব্দ নির্মাণ কিংবা বাছাই শ্রমের অপচয় নয় কোনোভাবেই। প্রতিটি জাতির ইতিহাসে তাদের ভাষার ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ আসলে সেগুলোই, যখন এই চেষ্টাটা সবচেয়ে বেশি মাত্রায় ঘটেছে।

পরিভাষাকে একটা অনতিক্রম্য সংকট হিসেবে প্রদর্শন শুধুমাত্র সেইসব মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব, যাঁরা এই জুজু দেখিয়ে ভাষার আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে চান, নিজেদের জন্য সুবিধাজনক কারণেই। নতুন পরিভাষা কিভাবে আসে, সে নিয়ে সত্যেন বোসের আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করছি আমাদের আজকের আলোচনা :

"জলে না নেমে সাঁতার শেখানোর দুরাশার মত, ভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার চেষ্টা না করে শুধু পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছে।"–সত্যেন বোস, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন।

আসল সর্বনাশটা তাই এখানেই ঘটেছে। বাংলা ভাষায় পরিভাষার দৈন্য যতটাই থাকুক, পরিভাষা নিয়ে যাঁরা হাসাহাসি করে মাতৃভাষাকে উচ্চ জ্ঞানচর্চা থেকে বঞ্চিত করার অজুহাত খুঁজছেন, তাঁরা এই সুযোগটা ওখানেই পেয়েছেন–আমাদের রাষ্ট্র, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা যথাসম্ভব পরিহার করেছে বলেই স্বাধীনতার এত বছর পরও বাংলা পরিভাষার সম্ভাবনা আমাদের কাছে বেখাপ্পা মনে হয়।

ফিরোজ আহমদ: প্রাবন্ধিক ও রাজনীতিবিদ
ইমেইল: subarnasava@gmail.com